অনবদ্য বর্ণনাগুণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

ডঃ মমতাজ বেগম
অধ্যাপিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

[বিষয় চুম্বক ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন নানা কারণে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর গল্পের চমৎকার বর্ণনাগুণ। লেখকের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ, প্রাচীন আদিমতার স্বরূপ। প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র জান্তবতা, প্রাকৃতিক পরিবেশ — এ সবই তাঁর বর্ণনাগুণে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও মানুষের ভয়াল ভয়ঙ্কর নিখুঁত রূপ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ণনার মূল হাতিয়ার হল শব্দ। ভাষা নানান বিভঙ্গতায় ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদল করেছে। গল্পের রসবোধকে, কৌতুহলকে ইঙ্গিতপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় ও শিল্পসঙ্গত করে তুলতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য বুনন ক্ষমতা আজকের পাঠককেও বিস্মিত করে। শুধু গল্প পড়া নয়, আধুনিক মানুষ নিজের অন্তরে আলো ফেলে নিজেকেও চিনে নিতে পারবেন অনায়াসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে।]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলির প্রথম পরিচয় অনবদ্য বর্ণনাগুণ, জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সব সময়েই মনে রেখেছেন বাস্তবতা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় জীবন যখন নির্মোহ, আবেগহীন, রোমান্টিকতাহীন হয়ে পড়েছে তখন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা মুগ্ধতাকে নতুন রূপে বুনে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জীবন সম্পর্কে নানান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জীবনের গতিমুখ পরিবর্তনের মন্ত্রটিকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করেছে। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন — 'ছোটগল্প লিখে অনেক তৃপ্তি পাই'।

আকণ্ঠ জীবনপিপাসায় নিমগ্ন থেকে জীবনের কথাকলিকে একটি একটি করে গেঁথে তুলেছেন নক্‌শিকাঁথায়। গল্প বলার জন্য অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আধুনিক সমালোচকের কথায় বলা যায় —

'Now - a - days reading of story is not for pleasure, but for understanding'[১]

জীবনের বাঁচার লড়াইকে আরও মজবুত করতে, এক বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপন করতে 'understanding' এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। চেতন অবচেতনের লড়াইয়ে ক্লান্ত আধুনিক মানুষ মানবিকতা অমানবিকতার রুঢ় রুক্ষ রূপের সম্মুখীন। অন্তর্মুখী আত্মসমীক্ষায় মধ্যবিত্ত মানসিকতা যখন ক্ষত- বিক্ষত তখন নিজের গর্বিত মুখের উজ্জ্বল ছবি দেখার জন্য লোলুপ আর এক শ্রেণীর মানুষ। এসব বর্ণনা পাওয়া যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ', 'হাড়', 'বীতংস',

'রেকর্ড', 'ভাঙ্গা চশমা', কাণ্ডারি' প্রভৃতি গল্পে।

'টোপ' গল্পের একটি অংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় —

'হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝির ডাক চারিদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা - এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পা ও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠান্ডা, ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে নীরবতার দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।'[২]

একদিকে ভয়ঙ্করতা অন্যদিকে বিংশ শতকীয় জীবন সঙ্কট একাকার হয়ে গেছে এই বর্ণনায়। এক অমানবিক শিকার প্রস্তুতি পাঠকের রোমকে খাড়া করে তুলছে। আধুনিক যুগের মানুষ প্রতিটি মুর্হূতে ওত্ পেতে বসে আছে শিকার ধরার অভিপ্রায়ে। শিকারের জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর অর্থ সম্বলহীন মানবশিশুকে। মানুষ হয়ে মানবশিশুকে ব্যবহার করার অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য বর্ণনায়।

'দুঃশাসন' গল্পে মন্বন্তরের নিষ্ঠুর ছবি বাস্তবনিষ্ঠ অথচ রসঘন করে উপস্থাপন করেছেন লেখক। সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি একটি বাক্যেই সম্পূর্ণ— 'মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন'[৩]

তার এই অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন —

'কোনোখানে এক ফালি কাপড় নেই - কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নিলর্জ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।'[৪]

ধরিত্রীর সন্তানরা তাকেও বিবস্ত্র করতে ছাড়েনি, নারী ও পৃথিবীর মিলিত প্রতিবাদী সত্ত্বা ব্যঞ্জনায়িত হয়েছে গল্পের শেষে —

'ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙ্গা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে - তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে।'[৫]

এই ধার একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ব্যথার বহিঃপ্রকাশ। একদিকে গাঢ় অন্ধকার অন্যদিকে আলোর রোসনাই, আমোদ প্রমোদের বাড়াবাড়ি অন্ধকারের গাঢ়ত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে, বাঁচা-মরার লড়াইকে পরিস্ফূট করেছে—

'কেরোসিনের অভাবে আজকাল অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। বাঁশবনের ছায়ায় জংলা পথের পাথুরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মানুষ আজকাল চলাফেরা করে — মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপ। কার মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে। রোজ দু'তিনটে করে সাপে কাটার এজাহার আসে থানাতে, - মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর হিংসা যেন

নির্মম হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুচিপাড়ায় একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, পরশু দিন নিশুত রাতে ওর ঘরের বেড়া ভেঙ্গে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।'[৬]

এ বর্ণনা শুনলে সুস্থ মানুষ সুস্থির থাকতে পারে না; তার গায়ে কাঁটা দেয়, ভয়ে আঁৎকে ওঠে। সমাজ বাস্তবতার এমন নির্মম সাহসী বর্ণনা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া প্রায় দুর্লভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্বন্তরের হাত ধরে দুঃশাসন গ্রাস করেছিল বাংলাকে। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আপন অনুভবের স্বকীয়তায় অপশাসন এবং তার আনুষঙ্গিক চিত্রকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন বর্ণনার কারুকার্যে।

'জান্তব' গল্পটির বর্ণনার বুনন অনবদ্য। নারী পুরুষের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে যখন অবিশ্বাস বাসা বাঁধে তখন জেগে ওঠে জান্তব প্রবৃত্তি। গুম্ফা লামার স্ত্রী মাইলি অন্য পুরুষের সাথে রাত্রিযাপন করলে তাকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। তারপর তার জীবনের একমাত্র সঙ্গী হয় কুকুর লাল্লু। কিন্তু যখন জীবন মরণের সঙ্কট উপস্থিত হয় প্রচণ্ড ঠান্ডায় তখন সে লাল্লুকে লাথি মেরে ফেলে দেয় পাহাড়ের নীচে। পরবর্তী সময়ে লাল্লুর জন্য আপশোষ হলে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে গুম্ফা লামা লাল্লুর অনুসন্ধানে। পরদিন সকলে দেখে একদল কুকুর গুম্ফা লামার শরীরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। মানুষ ও ইতর প্রাণীর দ্বন্ধের চিত্রকে লেখক স্পষ্ট করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায়—

'বাইরে ঝড় চলছে সমানে, হয়তো বা আরো প্রবল বেগে। ... কম্বলের খস্‌খস্ রোঁয়া ঘষে ঘষে গায়ের ছাল উঠে যাচ্ছে, কিন্তু এতটুকু উত্তাপও সঞ্চারিত হচ্ছে না শরীরের মধ্যে। গুহার গা বেয়ে আরো বেশি করে চুঁইয়ে পড়ছে বরফগলা জল। গুম্ফা লামা মরে যাচ্ছে - গুম্ফা লামা জমে যাচ্ছে। এতদিন পরে সত্যিই মরে যাচ্ছে গুম্ফা লামা, এই ষাট বছর পর। ... হঠাৎ পায়ে তীব্র আঁচড় লাগল—শাণিত ধারালো নোখের আঁচড়। গুম্ফা লামার চমক ভাঙ্গল। লাল্লু ঢোকবার চেষ্টা করছে, প্রাণপণে ঢোকবার চেষ্টা করছে। এই কম্বলে দুজনের জায়গা হবে না - হয় জন্তুর, অথবা জান্তব মানুষের।— লাল্লু .... প্রচণ্ড বেগে ধমক দিলে গুম্ফা লামা। কিন্তু চিরকালের আজ্ঞাবহ লাল্লু আজ তার আদেশ শুনল না। যেমন করে হোক সে ঢুকবেই।

আবার একটা প্রচণ্ড লাথি - আবার কুকুরটা ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে। কিন্তু এবারে আর কাতর আর্তনাদ নয়। লাল্লু স্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার পিঙ্গল চোখ দুটো বাঘের মতো ঝিকিয়ে উঠল নির্মম হিংসায়।'[৭]

কাহিনীর ও চরিত্রের অবয়ব নির্মাণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৌঁছে গেছেন অস্তিত্বের গভীর প্রকোষ্ঠে। জীবন মরণের কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ নিটোল শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিকে। শুধু মানুষ নয় প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রকৃতির ইচ্ছে যে কত প্রবল তাও স্পষ্ট

করেছেন। ভালবাসা ততক্ষণ জীবন্ত থাকে, যতক্ষণ একে অপরের হৃদয়ের অনুভবের ভাষা বুঝতে পারে। যখন স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র দেওয়াল একে অপরকে পৃথক করে দেয় তখন দুজনেই হয়ে ওঠে দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রেম, ভালবাসা, সোহাগ, ত্যাগ সব কিছুর উর্দ্ধে অবস্থিত জান্তব প্রবৃত্তি।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের ভিন্ন স্বাদ আনতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণনাভঙ্গীর স্বাদকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। লেখকের অন্তর্মুখীন অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা, জান্তব প্রবৃত্তি এককার হয়ে গেছে তাঁর গল্পগুলিতে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ এক আত্মিক সঙ্কটের সন্মুখীন। আদর্শহীনতা, নীতিহীনতা, অমানবিকতার নিলর্জ্জ চিত্র গল্পের বর্ণনায় তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে। মানুষে মানুষে অনন্বয় জীবনের অবক্ষয়কে কত গভীরভাবে ত্বরান্বিত করেছে প্রতিটি গল্পে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক মানুষের মধ্যে পলায়নবাদী মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'ভাঙ্গা চশমা' গল্পে দেখা যায়—

'একবার হেডমাস্টারের দিকে তাকালাম।.... নিঃশব্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি বেরিয়ে এলাম, তারপরে দ্রুতপায়ে আম বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম।... যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই - আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।'[৮]

গল্পের নায়কের এই আত্মসমীক্ষা পরবর্তী বর্ণনায় আরও ব্যঞ্জনায়িত হয়ে ওঠে—

'আমার দামী কোটের ক্রিজগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকমক করতে লাগল। হাকিমী জুতোর উদ্ধত পদক্ষেপে আর্তনাদ করতে লাগল ধুলোয় ভরা গ্রামের পথ। হেডমাস্টারের মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল আর নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল শেয়াল।'[৯]

আদর্শ ও নীতির গলা টিপে ধরে কৌশল কিভাবে জায়গা করে নিয়েছে তার প্রতীক হল শেয়ালের তারস্বরে চীৎকার। তাছাড়া শেয়াল নিশাচর, অন্ধকারেই তার কর্মযজ্ঞ। আধুনিক মানুষও ক্রমশ সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। আলো অপেক্ষা অন্ধকারকেই বেশি আপন করে নিচ্ছে। মানুষের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ববোধ। মানুষ দিন দিন ভুলে যাচ্ছে অন্যের হৃদয়ের অনুভূতির কথা। নিজের স্বার্থে মগ্ন থেকে সকলের অজান্তেই হারিয়ে ফেলছে ভালবাসার বাসরঘর। সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা যায় কিন্তু বিবেকের তাড়না, যন্ত্রনা থেকে আমাদের কোনো রেহাই নেই। জীবনানন্দ দাশ 'বোধ' কবিতায় বলেছেন -

'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, ভালোবাসা নয় / আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের /অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেলা করে /আমাদের ক্লান্ত করে।'[১০]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের উপরিউক্ত বর্ণনায় জীবনযন্ত্রনার এই ছবি সুস্পষ্ট। কালচেতনা সময়চেতনা, মানুষের অন্তর্গত বোধ বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় ভাঙ্গা চশমার মতোই অতি

প্রয়োজনীয় জিনিসের হারিয়ে ফেলার সঙ্গে ব্যঞ্জনায়িত হয়েছে। যুগের হাওয়ার সঙ্গে নিজের চেতনাকে মিশিয়ে এক স্বতন্ত্র গল্পপরিধি নির্মাণ করেছেন তিনি। তাঁর গল্প সম্পর্কে ডঃ সরোজ মোহন মিত্র বলেছেন —

'দেশের মুক্তি, সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নারায়ণের শিল্পীসত্তার কাছে ছিল এক প্রধান প্রেরণা।'[১১]

প্রতিটি ছোটো ছোটো তুচ্ছ জিনিস তাঁর ভাবনার গুণে, বর্ণনার গুণে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের আর একটি কথা থেকে জানা যায় —

'বাঙলাদেশের মাঠঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত, তার বন-তুলসীর ঝাড়, তার শরতের সোনা ঝরানো আকাশ, ডুয়ার্স টেরাই এর গভীর অরণ্যাঞ্চল, বনজ্যোৎস্না, ইতিহাসের ধূসর অতীত ও গভীর রোমান্টিকতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বিস্তৃত পটভুমি রচনা করেছে।'[১২]

গল্প বলার নির্মাণ কৌশল গল্পের ভাবকে বৈচিত্র্যময় ও নতুন করে তোলে। সহজ নিত্যলব্ধ উপলব্ধি তখন পাঠকের সামনে ধরা দেয় অচেনা রূপে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে রোমান্সের উদ্দামতা নেই, নেই পারিবারিক সামাজিক মন টানাটানি, কিন্তু বিষয়বস্তুর তীক্ষ্ণ আবেদন ব্যাপকতর হয়ে ওঠে বর্ণনা গুণে। এক অন্তর্নিহিত কারুণ্য পাঠকের মনে নীরব অথচ গভীর জ্বালা ধরায়। গল্পের শুরু থেকেই পাঠকের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় বর্ণনার মর্মমূলে। চুম্বকশক্তির মতো টেনে নিয়ে যায় পারিপার্শিক পরিবেশের মধ্যে। শব্দ, ভাষা, বর্ণনার নিটোল গভীর বুননে তৈরী হয়েছে অপূর্ব সমন্বয়। পাঠকের কৌতুহল থাকে গল্পের শেষ লাইন পর্যন্ত। বাংলা ছোটগল্পের নতুন স্টাইল তাঁর রচনারীতিকে অনবদ্য করে তুলেছে। তাঁর স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে সমুজ্জ্বল প্রায় প্রতিটি গল্প। গল্প বলতে বলতে বিশেষ এক জায়গায় নিয়ে এসে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া এবং আধুনিক মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার কৌশলই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তাঁর বর্ণনারীতি গল্পে এনেছে তীব্রতা, ক্লাইমেক্স, ব্যঙ্গের কষাঘাত। তাঁর বর্ণনা ভঙ্গিমা সহজে অনুসরণযোগ্য নয় কারণ তা মননসমৃদ্ধ, ভাবাতিশয্যহীন। প্লটের সঙ্গে আবেগের, সুরের, বাস্তবতার, সত্যতার প্রতীতি ছোটগল্পের বুননকে আকষণীয়, অনবদ্য ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছে যা প্রত্যেক জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী মনের কাছে আস্বাদ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান গুণ তাঁর প্রতিটি ঋজু গল্প বক্তব্য ভারে বিশিষ্ট, সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তির যন্ত্রণা, অবক্ষয়, মূল্যবোধের ভাঙন প্রতিটি বিষয়ে তাঁর ছোটগল্প শানিত তরবারির মতো সত্য উন্মোচন করেছে।

১) সাহিত্যে ছোটগল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা পৃঃ ২২৩

২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প — জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃঃ ৭১

৩) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮

৪) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮

৫) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮

৬) প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪

৭) প্রাগুক্ত পৃঃ ৮২

৮) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গে ও প্রকারণ - বীরেন্দ্র দত্ত পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃঃ ৩২৩

৯) প্রাগুক্ত

১০) একালের কবিতা সংকলন - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, পৃঃ ১৩

১১) বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প - ডঃ সরোজমোহন মিত্র, তুলসী প্রকাশনী, পৃঃ ২৬৩

১২) প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৩